বাংলাদেশ, মুসলমান-সমাজ ও প্রতিবাদী সংস্কৃতি

অরুণ সেন

'বাংলাদেশ' সম্পর্কে কোনো কথা উঠলেই ঐতিহাসিক ক্রমে সেই দেশের (বা রাষ্ট্রের) জন্মকাহিনি এবং পরিবর্তন-রূপান্তরের ইতিবৃত্তকে জানতে হয়। বাংলাদেশ-এর আধুনিকতায় পৌঁছোতে গেলে সেই পাঠ খুবই জুরুরি।

১৯৪৭-এর দেশভাগের আগে ছিল অখণ্ড বাংলা—কিন্তু তারও খণ্ডাংশে একটা পার্থক্য অবশ্য নিহিত থাকত আগেই। তারই একটি অংশকে তখন কথাসূত্রে বলা হত 'পূর্ববঙ্গ'। পদ্মার এপারের রাঢ়-বঙ্গ এবং ওপারের পূর্ব-বঙ্গ দেশ-পরিচয়ে এক হলেও অনেক বিষয়েই তাদের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। একই বাংলাভাষার নানা আঞ্চলিকতা, সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতির লক্ষণ টের পাওয়া যেত শহরে ও গ্রামে। ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের মেলামেশা সত্ত্বেও পূর্বপারের এই দেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য তো মানতেই হয়। বাংলাদেশের আধুনিকতাকে জানতে হলে, কীভাবে সেই মুসলমান-সমাজেও পরিবর্তন ও ক্রমোন্নতি ঘটল, তা ঐতিহাসিক ক্রমিকতাতেই অনুধাবন করতে হয়। রাজনীতির সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির আন্দোলন কীভাবে সে-দেশের মুসলমানকে পৌঁছে দিয়েছিল তার নিজস্বতার বোধের মধ্যেও তাকে অতিক্রম করে সামগ্রিকতার বোধের জগতে—বাস্তবের সক্রিয়তা বা কার্যক্রমে। সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠপটই উন্মোচিত হতে পারে পরবর্তী আলোচনায়। সেই উন্মোচনের সচেতনতার বিবৃতি শুরু হয়েছিল অন্তত বছর ১৩ আগে— কিন্তু তা এখনো অবান্তর হয়ে যায়নি।

গত শতাব্দীর বিশের দশকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রতিবাদী চেতনার জন্ম হল। কীসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? সে-সময়ে বঙ্গীয় সমাজে, বিশেষত মুসলমান সমাজে, নানা ধরণের গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব খুব প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেই গোঁড়ামি সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তার বিরুদ্ধেই ১৯২৬-এ পূর্ববঙ্গের ঢাকায় এক প্রতিবাদী সাহিত্যসংস্কৃতির আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কয়েক বছর আগেই ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের কিছু তরুণ শিক্ষক ও ছাত্র মিলিতভাবে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন অচিরে। তারই নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। অন্যতম উদ্যোক্তা কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, এই 'সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক' প্রতিষ্ঠানের মূল মন্ত্র 'বুদ্ধির মুক্তি'— 'বিচারবুদ্ধির অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান।' কাজী আবদুল ওদুদ ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন অগ্রণী তাঁরা হলেন আবুল হুসাইন ও কাজী মুতাহার হুসাইন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রধান কাজ ছিল 'শিখা' পত্রিকার প্রকাশ— বস্তুত সেই পত্রিকাটির মধ্য দিয়েই তাঁদের পরিচিতি। আর সেই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রকাশক হিসেবে আবদুল কাদির এবং সম্পাদক হিশেবে আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও আবুল ফজল। এই সংগঠন এবং পত্রিকার প্রচার যে খুব ব্যাপক ছিল তা নয়, কিন্তু 'ঢাকায় উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা জগরণের সাড়া পড়িয়া যায়।' (আবদুর রহমান খাঁ, 'আমার জীবন' ঢাকা,

১৯৬৪)। 'শিখা'-র সঙ্গে হয়তো তুলনা হয় না, কিন্তু তার পাশাপাশি কলকাতা ও ঢাকা-র শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এরকম নতুন চিন্তার উদ্বোধক আরো কিছু পত্রিকার কথা বলেছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। যেমন, কলকাতা থেকে 'সওগাত' ছাড়াও 'খাদেম' (১৯২৬), 'হিন্দু-মুসলমান' (১৯২৬), 'গণবাণী' (১৯২৬), 'সাহিত্যিক' (১৯২৭), 'নওরোজ' (১৯২৭), 'মোয়াজ্জিন' (১৯২৮), এবং ঢাকা থেকে 'তরুণপত্র' (১৯২৫), 'অভিযান' (১৯২৬), 'জাগরণ' (১৯২৮), 'সঞ্চয়' (১৯২৮) ইত্যাদি (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সংকলিত ও সম্পাদিত 'শিখা সমগ্র', ঢাকা, ২০০৩)। অবশ্য গোঁড়া মুসলমানদের যে-সব পত্রিকা সমকালেই বেরোত, যেমন 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মোসলেম দর্পণ, 'ইসলাম নূর', 'শরিয়তে এসলাম' ইত্যাদি, সেগুলো অনেকবেশি শক্তিশালী ও বহুলপ্রচারিত, কিন্তু 'শিখা' ও সহধর্মী পত্রিকাগুলো বলা বাহুল্য মুক্তচিন্তার প্রচারক বা প্রতিরোধের সংস্কৃতির বাহক হিসেবে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্থাৎ, এ সময় থেকেই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষের সংখ্যা ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে এবং তাঁদের একটা বড়ো অংশ আধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। শুধু তা-ই নয়, মননশীলতার ও সৃজনশীলতার নানা দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে শিক্ষিত হিন্দুর ব্যবধান একটু একটু করে হলেও হ্রাস পেতে থাকে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে-সব নতুন চিন্তা ও সক্রিয়তা দানা বাঁধছে, তাঁরাও তার শরিক হতে থাকেন। ১৯৩৬-এ ফ্যাসিজমের সঙ্গে সংঘাতের পটভূমিতে যে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' এবং সেই সূত্রে কলকাতায় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তারই প্রভাব এসে পড়ে ১৯৩৯-এ ঢাকায়। ১৯৪০-এ গেন্ডারিয়া হাইস্কুলের ময়দানে কাজী আবদুল ওদুদের সভাপতিত্বে পূর্ববঙ্গে সংঘের প্রথম সম্মেলন। ১৯৪২-এ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনের সময় সোমেন চন্দ্রের মৃত্যু এবং সে বছরই সংঘের নতুন নামকরণে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' পূর্ববঙ্গে, প্রধানত ঢাকায়, এক 'প্রগতিশীল সাহিত্য পরিবেশ' সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু খুবই সংখ্যাল্প এই শিক্ষিত প্রগতিশীলেরা তখন পূর্ববঙ্গে। তার বাইরে অধিকাংশ মুসলমানই, এমনকি শিক্ষাপ্রাপ্তরাও, রক্ষণশীল ও ধ্যানধারণার দিক থেকে পশ্চাদ্‌মুখী। রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশটাই ছিল তা-ই। তাই ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাবের পরিণতিতে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকরা পাকিস্তানি আদর্শের পক্ষে দলবদ্ধ হন এবং ১৯৪২-এ কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' তৈরি করেন। এবং তার পরে-পরে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। ১৯৪৩-এ ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সভাপতি এবং সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদক। সংসদ-এর লক্ষ্যই ছিল ইসলামি ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ করে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং ইসলামি আদর্শ প্রচার করা।

'১৯৪৪-এর জুলাইয়ে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন'—সেখানেও মুসলমান জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সংক্রামিত করতে চাওয়া হয়েছে 'পাকিস্তানি চেতনা'। সাহিত্য সংসদ-এর সম্মেলনের চেয়ে এ-সম্মেলন ছিল আরো ব্যাপক ও উগ্র।

অর্থাৎ, নব-শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে প্রথম থেকেই দুটি ধারা তৈরি হল। তার

মধ্যে একটি ধারা তো ছিলই, পেছন দিকে মুখ ফেরানো এবং [illegible]। আর তার পাশে, প্রথমে যতই ক্ষীণভাবে হোক, এই নতুন [illegible] সংস্কৃতি— ভাবনা।

দুই

১৯৪৭-এ পাকিস্তান গঠিত হবার পর থেকেই এই দুটি ধারাই প্রবলভাবে মুখোমুখি হল। পাকিস্তানি আবহাওয়ায় প্রগতিবিমুখ চিন্তাধারার প্রসার খুবই স্বাভাবিক। সে সময়ের পুঁথি সাহিত্যের অনুসারী রচনার প্রাচুর্য ও পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উচ্চকণ্ঠ খুবই নজরে পড়ে। (দ্রষ্টব্য ঃ হুমায়ুন আজাদ, 'ভাষা আন্দোলন ঃ সাহিত্যিক পটভূমি, ঢাকা, ১৯৯০)। কিন্তু, অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্যসংস্কৃতির প্রতিবাদী চেহারাটাও যে উঠে এল, সেটাই ব্যতিক্রমী ঘটনা।

দুটি প্রধান সূত্রকে আশ্রয় করে এই প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল। প্রথমত, ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল্যায়ন। এটা ঠিক, দ্বিজাতিতত্ত্বকেই অবলম্বন করে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল, এবং ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবেই তার পরিচয়—কিন্তু সেই ইসলামের প্রত্যক্ষ চেহারায় যে অতীতচারী অন্ধ কূপমণ্ডূকতার প্রাধান্য ছিল, এবং তাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রধান হয়ে উঠেছিল, সেটা সকলে মানেননি। তাই ইসলাম ধর্মের শুদ্ধতা নিয়ে, তার আলোকিত দিকগুলি নিয়ে কথা বলা শুরু হয়ে গেল।.বোঝা গেল, ইসলাম ধর্মের অনুগতদের মধ্যেও প্রগতিভাবনা নেই এমন নয়। কিন্তু তাঁদের দেখা ইসলামের আদর্শের সঙ্গে মিল নেই ইসলামের রাষ্ট্রীয় চরিত্রের। দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুসলমানের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির স্থান। পাকিস্তানবাদী উগ্রপন্থীরা উর্দু ভাষার পক্ষে এবং পাক-সংস্কৃতি নামক এক বস্তুর সমর্থনে উৎসাহিত হয়েছে। কিন্তু তার বিপক্ষে, এবং বাংলা ভাষা ও বাংলার সংস্কৃতির সপক্ষে একাত্মতা অনুভব করেছে বাঙালি মুসলমানদের অনেকেই। এভাবেই সংস্কৃতির দুটি ধারার দ্বন্দ্ব ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তানের সূচনা-পর্বেই।

দ্বন্দ্বের সূচক হিশেবে এই যে দুটি প্রসঙ্গের কথা বলা হল, তা সর্বপ্রথম যে সংগঠনের প্রতিবাদীমুখী চেহারার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেল, তার নাম 'তমদ্দুন মজলিস'। ১৯৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম-এর নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ গঠন করেছিলেন এটা। তাঁদের লক্ষ্য ছিল 'ইসলামী আদর্শ অনুসারী প্রগতিশীল' একটি আন্দোলনকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ইসলামেরই অনুগত বলতেন, এবং সেই আদর্শেরই টানে নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূর করে 'সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদে'র ভিত্তিতে একটি 'সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন', অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, গড়ে তুলতে চাইলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত গৌরবজনক আয়ুষ্কালে 'তমদ্দুন মজলিস'-এর প্রধান অবদান ছিল ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল ১৯৪৮-এ ও ১৯৫২-তে, প্রাথমিকভাবে তাতে 'তমদ্দুন মজলিস'-এর সক্রিয় ভূমিকা। বস্তুত তাদেরই কর্মতৎপরতায় গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'— ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল যাদের হাতে। পরবর্তীকালে অবশ্য ভাষা ও সংস্কৃতির নানা ব্যাপারে মজলিস-এর মধ্যে মতভেদ পাকিয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত রক্ষণশীলতা

তাকেও গ্রাস করে। ১৯৫৪-এর পরে বস্তুত তার অস্তিত্বই গৌণ হয়ে যায়।

তুলনায় আরো প্রাগ্রসর ও অপোসহীন সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এল ১৯৫১-তে প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃতি সংসদ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বলেই পরে এর নাম হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ'। মূলত সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত সাম্যবাদী ছাত্র ও শিক্ষকদেরই উদ্যোগ ছিল। আর পেছনে ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও খান সারওয়ার মুরশিদদের মতো ব্যক্তিরা। পূর্ববাংলার বহু তরুণ লেখক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক ও সংস্কৃতিসেবীরা যোগ দেন এই সংগঠনে। বিভিন্ন কর্মসূচিতেই টের পাওয়া যায় এর প্রগতিশীল রাজনৈতিক চরিত্র—যেমন, বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকাভিনয়, দেশাত্মবোধক ও গণসংগীতের অনুষ্ঠান, বর্ণময় পোস্টার বা দেয়ালপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক এই সংগঠন কিন্তু তার সীমা ছাড়িয়ে, অন্তত ষাটের দশক পর্যন্ত, 'গোটা পূর্ববাংলায় সংস্কারমুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পাকিস্তান আমলে সংস্কৃতি সংসদ পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করে।'

দেশভাগের আগে ইসলামি ঐতিহ্যের ধারক 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর কথা মনে আছে, কিন্তু ১৯৫২-তে যে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠিত হয়েছিল, তার সঙ্গে নাম ছাড়া কোনো মিলই নেই এই নতুন সংগঠনের। কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন এর সভাপতি এবং ফয়েজ আহমদ প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। 'সওগাত'-এর সম্পাদক নাসিরউদ্দীন ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গণি হাজারী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান প্রমুখ। এতেই স্পষ্ট হয়, যে কথা বলেছেন হাসান হাফিজুর রহমান, সে সময়ের 'প্রতিক্রিয়ার কাছে এদেশের সাহিত্য যে আত্মসমর্পণ করেনি বা পরাজিত হয়নি, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ভূমিকাই তার জন্য সর্বতো কৃতিত্বের দাবিদার।' ১৯৫৩-তে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সংকলন, ১৯৫৪-তে ঢাকার সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫৫-তে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনুষ্ঠান ইত্যাদি 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এরই অবদান।

তিন।

পাকিস্তান আমলের প্রথম থেকেই বাংলাভাষার ওপর যে-সব পদ্ধতিতে আঘাত হানা হয়েছিল। বাংলা ভাষার মধ্যে বেপরোয়াভাবে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া, আরবি হরফে বাংলা লেখা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা করা। তার বিরুদ্ধে নানা দিক থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগের সম্মেলন, 'তমদ্দুন মজলিস'-এর প্রচার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা, পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র বাংলা ভাষার সপক্ষে দাবি এবং 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর আন্দোলন ইত্যাদি ঘটে চলেছে। ১৯৪৮-এ প্রথম এবং ১৯৫২-তে প্রবলতর ভাষা আন্দোলন তো আসলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনই যা কালক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সময়েই পৃথকভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিরোধী সাংস্কৃতিক উদ্যোগও নেওয়া হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪-এর মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে অন্তত পাঁচটি স্মরণীয়

সাহিত্য সংস্কৃতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই মনোভাব নিয়েই। কালানুক্রমিক তার উল্লেখ করা হল ঃ

ক. ১৯৪৮-এ ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হাবীবুল্লাহ বাহার। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পাকিস্তানি চেতনার হয়তো কোনো স্পষ্ট বিরোধিতা করা হয়নি, বরং অনুষ্ঠানসূচির নানা পর্যায়ে, যেমন গোলাম মোস্তাফা প্রমুখের ভাষণে, বরং তার প্রশ্রয়ই ছিল— কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙালি-চেতনা সম্পর্কে সমর্থন ও আনুগত্যও অনুভূত হয়েছিল। আরো একটি দিক উল্লেখযোগ্য ঃ সে-সময়ের উগ্রবাদী রাজনীতির প্রকোপে পূর্ববঙ্গের রবীন্দ্রবিরোধী মার্কসবাদীরা যেমন এই সম্মেলন বর্জন করেছিলেন (যেহেতু হিন্দু-মুসলমানের সামগ্রিক ঐক্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সমর্থনই বেরিয়ে এসেছিল প্রধান উদ্যোক্তাদের ভাষণে), তেমনি অন্য কারো-কারো কথায় 'নতুন পাকিস্তানী সাহিত্য'-র প্রত্যাশা উচ্চারিত হয়েছে। মূল সভাপতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষণ 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' দিয়ে শেষ করলেও তিনিই সেই বিখ্যাত উক্তি করেছেন ঃ 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী।' সেই ভাষণে একদিকে বঙ্গসংস্কৃতিতে মুসলমানদের গৌরবজনক ভূমিকার কথা যেমন বলা হয়, তেমনি বলা হয় হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ অবদানের কথা।

খ. ১৯৫১-তে চট্টগ্রামে 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। পাকিস্তানের জন্মের পরে গঠিত 'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'প্রান্তিক' একসঙ্গে মিলে ১৯৫১-র ১৬ মার্চ চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মূল সভাপতি এবং বেগম সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথি। কমিউনিস্টদের ব্যাপার এই অভিযোগ তুলে সোরগোল করা হয়েছিল— অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আবুল ফজলের স্মৃতিচারণে জানা যায়। তা সত্ত্বেও সম্মেলন যে সফল হয়েছিল, সে-বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। সম্মেলনের বক্তৃতামালায় প্রায় প্রত্যেকের কথায় প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সংস্কৃতির উদার প্রেক্ষাপটের বিষয়ে আগ্রহ। চিত্রপ্রদর্শনী ও সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ছিল এই উপলক্ষে।

গ. ১৯৫২-তে কুমিল্লায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। 'কুমিল্লা প্রগতি মজলিশ'-এর প্রেরণায় ১৯৫২-র ২২-২৪ আগস্ট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায়, কুমিল্লা শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন সংগঠন যোগ দেয়। এখানেও মূল সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। বামপন্থীরা প্রধানত উদ্যোক্তা। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সংস্কৃতির সমন্বয় এবং 'মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সাম্যবাদ'-এর ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য। সে-কারণেই বোধহয় এটাও সরকার বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্মেলন রূপে আখ্যাত হয়। তিন দিন ধরে সংস্কৃতির নানা বিচিত্র বিষয়ে বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ বুদ্ধিজীবী ও লেখকেরা অসংখ্য প্রবন্ধ পড়েন বা আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পড়া হয়, পরিবেশিত হয় সবরকমের সংগীত, অভিনীত হয় বিজন ভট্টাচার্যের নাটক। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্পীরা অংশ নেন।

ঘ. ১৯৫২-তে ঢাকায় 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। 'তমদ্দুন মজলিস'-এর উদ্যোগে ১৯৫২-র ১৭-২০ অক্টোবরে ঢাকায় এই যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তার মূল প্রেরণা ছিল 'মানবকল্যাণকর' ইসলামি আদর্শ। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে বা 'গোঁজামিল' দিয়ে নয়, তার মধ্যে নিহিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরাই ছিল লক্ষ্য। দেশ-বিদেশের ইসলাম ধর্মের পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা অনেক প্রবন্ধ পড়েছেন বা আলোচনা করেছেন ইসলামি ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার শুদ্ধতা বিষয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই পূর্ববঙ্গের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে বড়ো করে দেখেছেন। ইসলামকে বিকার থেকে উদ্ধার এবং স্বাদেশিকতার বোধের উন্মোচন, দুটোই ছিল 'তমদ্দুন মজলিশ'-এর এই সম্মেলনের দায়। তাই তো এই সম্মেলনকে অনেকেই দেখেছেন 'ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে' এবং বিপরীত দিক থেকে তা সমালোচিত হয়েছিল ইসলাম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতার চক্রান্ত হিসেবে।

ঙ. ১৯৪০-তে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির যে সাময়িক উত্থান তারই পরিবেশে আয়োজিত হয়েছে এই সম্মেলন। ১৯৫৩ থেকেই তোড়জোড় হলেও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯৫৪-র ২৩-২৬ এপ্রিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন এর উদ্বোধক এবং সভাপতি আবদুর গফুর সিদ্দিকী। এই সম্মেলন উপলক্ষেই পূর্ববাংলার ১০৮ জন অগ্রণী শিল্পী সাহিত্যিক যুক্ত আবেদনপত্র প্রচার করেন। তার মূল ঘোষণা ছিল : 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ববাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্য'। কুসংস্কার, জাতিগত বা ধর্মগত বৈরীভাব, দেশব্যাপী নিরক্ষরতা সবেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছেন তাঁরা। সারা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পাঁচশো জন প্রতিনিধি এসেছিলেন সম্মেলনে। বিদেশে থেকেও বিশেষত ভারত থেকে লেখকেরা গিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সাহিত্যিকও বেশ কয়েকজন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন : কাজী আবদুল ওদুদ, মনোজ বসু, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিন ধরে বিরাট আয়োজন (বস্তুত জনপ্রিয়তার কারণে এক দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল), ঢাকা শহর জুড়ে বন্দোবস্ত, বিপুল জনসমাগম, প্রতিদিন আলোচনা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠান, বিশেষত মুশায়েরা। আবদুল লতিফের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দিয়ে সম্মেলনের শুরু এবং 'একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' দিয়ে সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠানের শুরু। ১৯৪৮-এর 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'-এ যে আশা ব্যক্ত করে ভাষণ শেষ করেছিলেন শহীদুল্লাহ, পাঁচ-ছ বছর পরে তিনিই নৈরাশ্য প্রকাশ করে বললেন : '১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড়ো আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে পরিস্থিতির হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম স্বাধীনতার নতুন নেশায় আমাদের মাতাল করে দিয়েছে। আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পাকিস্তানের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি আকুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তারা এইসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন যে, প্রকৃত সাহিত্য সেবা,

যাতে দেশ ও দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জনার স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চতর সরকারি কর্মচারী উশকানি দিকে কশুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা এমনকী বাঙালি নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে থাকলেন।' শুধু শহীদুল্লার উদ্বোধনী ভাষণেই নয়, অনেকেরই আলোচনায় পূর্ববঙ্গের নিজস্বতা এবং সামগ্রিকভাবে বাঙালি সত্তার দিকটি গুরুত্ব পায়। প্রায় প্রত্যেকেরই কথাবার্তায় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবির কথা ওঠে। নানাদিক থেকে বিরোধী মহলে সমালোচনাও হয় এই সম্মেলনের— তাদের এমনকী মনে হয় আমন্ত্রিতদের নির্বাচনে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

চার

ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তা আরো প্রসারিত হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের লড়াইও আরো তীব্র হয়ে উঠল, বিশেষত যখন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির অন্তর্কলহের পরিণতিতে শেষপর্যন্ত পাক সামরিক শাসন মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। ১৯৫৮-তে আইয়ুব খানের আবির্ভাবের ঠিক আগে কিংবা সমসাময়িককালে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও সবচেয়ে উচ্চকিত হল।

১৯৫৭-তে অনুষ্ঠিত 'কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন' একদিক থেকে যেমন যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধের সূচক তেমনি এই সম্মেলন উপলক্ষেই বাঙালির সবচেয়ে বড়ো ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। বিশেষত আগের সম্মেলনগুলির তুলনায়। 'কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল টাঙ্গাইলের কাগমারিতে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। লীগের সম্মতি ছিল না, কিন্তু ভাসানী সম্পূর্ণ স্বাধীন উদ্যোগে এই সম্মেলন ডেকেছিলেন ১৯৫৭-র ৮-১০ ফেব্রুয়ারি। ভাসানীর জনপ্রিয়তার কারণেই সম্ভবত দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শয়ে-শয়ে সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরা যোগ দেন প্রতিনিধি হিসেবে। একে একটা আন্তর্জাতিক রূপ দেবার জন্য বিদেশীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ভারত থেকেও গিয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রবোধকুমার সান্যাল, রাধারাণী দেবী প্রমুখ। বিরাট প্রস্তুতি কমিটি, বিশাল বিপুল আয়োজন, সম্মেলনস্থান পর্যন্ত অসংখ্য তোরণ, দেশবিদেশের বিভিন্ন মণীষীর নামে। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, এবং স্বাগত ভাষণ দেন ভাসানী স্বয়ং। সারাদিন ধরে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনাসভা— আলোচনার বিষয় অবশ্য অনেকসময় তার বাইরেও চলে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের লোকসংগীত, যাত্রা-নাটক, শরীর চর্চা এবং সেই সঙ্গে কুটিরশিল্পের প্রদর্শনী। আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন ঃ 'বাঙালি জাতির যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসর ব্যাপী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সৃজিত বাঙালির আলাদা জাতীয় সত্তা ও

সংস্কৃতির প্রতি বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন।' সম্মেলনের একটা বড়ো রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল পাকিস্তানের কাঠামোয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। আবু জাফর শামসুদ্দীন তা-ই একে বলেছেন 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম সুস্পষ্ট দাবি এবং তজ্জনিত প্রয়োজনীয় সংগ্রাম।' কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মতো এত বড়ো 'ব্যাপকভিত্তিক' সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের আয়োজন বাংলাদেশের আর ঘটেনি বলেই অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে, খুবই স্বাভাবিক, সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে অনেক পত্রপত্রিকা, সংগঠন ও রাজনৈতিক দল (মুসলিম লীগ, 'দৈনিক আজাদ', এমনকী 'তমদ্দুন মজলিস')—প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে ভারতপ্রীতির অভিযোগে।

প্রগতিশীল সংগঠন ও তাদের সম্মেলনকে নস্যাৎ করাই শুধু নয়, মৌলবাদী চিন্তার মানুষেরা তাদের বিপুল জনশক্তি নিয়ে সাংগঠনিক ক্ষমতারও পরিচয় দেয় বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত সম্মেলনে। রাজনীতির মতো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্বের চেহারাটা থেকে যায়। তাই, এক বছর পরেই, ১৯৫৮-তে চট্টগ্রামে দেখতে পাই 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'। ১৯৫১-তে চট্টগ্রামেই 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' হয়েছিল এবং তা ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ও সংস্কৃতির ঔদার্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু এবার তার চরিত্রটা ভিন্ন প্রকৃতির।

চট্টগ্রামের এই সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৮-র ২-৪ মে। মূল সভাপতি ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ। অল্প আগেই ঢাকা, কুমিল্লা বা কাগমারির সম্মেলনে পাকিস্তানবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যবোধ জোরদার হয়ে উঠেছিল— চট্টগ্রামের সম্মেলনে যেন আবার সেই প্রাক্তনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হল, ইসলামি আদর্শের রূপায়ণের কথা বলা হল সোচ্চারে। তিন দিনের সভায় আলোচিত হল পাক-বাংলার আদর্শ ও সাহিত্য, পাক-বাংলার মনন, পাক-বাংলার চিত্রশিল্প। সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান একটি 'চমৎকার ইসলামি রূপ' প্রকাশ করবে, এই প্রত্যাশাই ছিল সকলের মুখে। এই সম্মেলনকে তাই 'পাক-বাংলা সাহিত্যাদর্শে' বিশ্বাসী শিল্পী সাহিত্যিকদের সম্মেলন বলা চলে— যদিও আগে বা পরে উদারপন্থী ছিলেন বা হবেন, এমন বুদ্ধিজীবীরাও অনেকে এখানে হাজির ছিলেন। যেমন, রেজাউল করিম, আবুল কালাম, শামসুদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মাহফুজুল হক প্রমুখ। তাই দেখা যায়, পাকিস্তানি আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও, অনেকেই পূর্ববাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির নির্মাণের কথাও বলেছেন।

এমনকী ঢাকাতেও আইয়ুব খানের আবির্ভাবের পরপরই 'রওনক সাহিত্যসংস্থা' (১৯৫৮-তে স্থাপিত)-র মতো প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাই, যেখানে ঘরোয়া সাহিত্যসভাতে পাক-বাংলার পক্ষে নিজেদের ভাবনাকে সংহত করার সুযোগ করে নেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও মুহম্মদ বরকতউল্লাহ-র পরিচালনায় কিছুটা বয়স্ক বা প্রবীণ লেখকেরা। অবশ্য 'রওনক'-এর ভাবধারাকে সম্পূর্ণ একদেশদর্শী বলা চলে না— তাদের প্রকাশনাতেই নজরুল বিষয়ক পূর্ববাংলার প্রথম সংকলনটির লেখক-তালিকায় অন্যদের সঙ্গে সে সময়ের তরুণ প্রগতিশীল লেখকেরাও ছিলেন।

১৯৫৯-এর জানুয়ারিতে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে যে পাকিস্তানের লেখকদের

সম্মেলন হয়েছিল, তাতে যোগ দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের অনেকেই। তার একটা বড়ো মাধ্যম হয়েছিলেন এনামুল হক। এই সম্মেলনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই ছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আনুকূল্য ছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রচ্ছন্ন হুমকিও ছিল পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানি আদর্শকে সমন্বিত ও বিকশিত করাই ছিল সম্মেলনের লক্ষ্য। তার জন্য নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় শাসকেরা। এই সম্মেলনে প্রগতিবিরোধী লোকজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন প্রগতিমুখী লেখকেরাও। এখানেই গঠিত হয় 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' এবং তার কর্মসূচী পালিত হয় পূর্ব পাকিস্তানেও। তিনটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। তাতে মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আশরাফ সিদ্দিকী, কাজী মোতাহার হোসেন, আনিসুজ্জামান প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন। লেখক সংঘ পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন আরো অনেকে। সংঘের কার্যকলাপ অনুসৃত হয় ষাটের দশকেও।

পাঁচ

ষাটের দশক জুড়ে, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের কালে, প্রতিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ল। ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশকে যে আলোড়ন ঘটেছিল, তা শুধু তখন বড়ো একটা রাজনৈতিক মাত্রা পেল তা-ই নয়, আগের পর্বের সাংস্কৃতিক কর্মসূচিগুলোও আরো তীব্রতা পেল। একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে প্রতি বছর একুশের গান গাইতে-গাইতে প্রভাতফেরি, রাস্তায় আলপনা, শহিদমিনারে ফুলের মালা এইসব আয়োজনের সঙ্গে সভা বা জমায়েত—ক্রমশই যেন বিস্তার পেতে থাকল। সন্‌জীদা খাতুন দেখিয়েছেন সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে, শুধু ভাষা-সাহিত্যেই নয়, সংগীত শিল্প বা মননচর্চায় প্রতিরোধের প্রেরণা কীভাবে সঞ্চারিত হল একুশে ফেব্রুয়ারির শিক্ষায়। অবশ্য যাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই, সেই পাকিস্তানের শাসকেরাও পালটা চাপ তৈরি করেছে অবিরল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন কিছুটা সফলও হয়েছে তারা। বহু লেখকই 'নিরাপত্তা' খুঁজেছেন, এবং হয়তো পেয়েছেনও। সরকারও ফাঁদ পেতেছে 'লেখক সংঘ' ইত্যাদি মারফত দাক্ষিণ্য বিলিয়ে। সন্‌জীদা খাতুনের ভাষায়, 'পাকিস্তান সরকার বেশ সুতো ছেড়েই খেলতেন।' কিন্তু সবমিলিয়ে সাফল্য আসেনি, বরং দেখা গেছে, সংস্কৃতি আন্দোলনে সমস্ত প্রচেষ্টাই 'একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষঙ্গী।' একুশে ফেব্রুয়ারি এই উচ্চারণটাই বছরের পর বছর কাটিয়ে একটা প্রতীকে পরিণত হল, সাংস্কৃতিক চেতনার উত্তরণ ঘটাল, মানুষকে পৌঁছে দিল রাজনৈতিক মুক্তিসন্ধানের রণাঙ্গণে। ভাষা-আন্দোলনের আগে, পাকিস্তানের গোড়াকার পর্বে, ভাষা নিয়েই বাঙালি মুসলমানের যে 'সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি', যার পরিণামে তৈরি হয় 'মুসলমানি বাংলা', কিংবা পরে প্রস্তাবিত হয় বর্ণমালা সংস্কার, রোমান বা আরবি হরফে বাংলা ইত্যাদি, তা ভাষা আন্দোলনের আবহে ও পরবর্তী ইতিহাসে সার্থক প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। প্রত্যাঘাতের চেষ্টাও অবশ্য কম হয়নি। ১৯৬০-এ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যখন জাহেদুর রহীম গান গাইছেন 'আমার সোনার বাংলা', তখন হামলা চালানো হচ্ছে ইসলামী ছাত্র সংঘের প্ররোচনায়। ১৯৬১-তে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালনের সময় 'ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা' প্রচার চালাতে থাকে

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, 'দৈনিক আজাদ'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয় ঃ 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে (কোহেনদার) ডাকের সমান এবং এ ডাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু।' রবীন্দ্রনাথ নিয়ে, তাঁর শতবর্ষ নিয়ে প্রবল বিতর্ক উশকে দেওয়া হয়েছিল। পরেও ১৯৬৫-তে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা কিংবা রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে সরকারি আমলাদের বা পেটোয়া মানুষজনের বিবৃতি-প্রচার সবই ঘটেছে। কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করেই রবীন্দ্রশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সাফল্য, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীতের সপক্ষে লেখক ও বুদ্ধিজীবীর সংহত প্রতিবাদ। তাই তো ওয়াহিদুল হক বলতে পারেন, পূর্ববঙ্গের 'রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক... প্রতিরোধের বড়ো হাতিয়ার ..... রবীন্দ্রসংগীত।' শুধু রবীন্দ্রসংগীতই নয়, এ-কথা প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার সূত্রেই। এরকম আরো অনেকই আছে। ১৯৬৩-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'— 'পূর্ববাংলাকে বাংলা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদা' দেওয়ার দাবিতে। ১৯৬৬-তে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবির পটভূমিতে, ছাত্রদের অংশগ্রহণে 'বাংলা প্রচলন সপ্তাহ' পালন— দোকানের সাইনবোর্ড বা গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখার দাবিও ছিল তাতে। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা নববর্ষের উৎসব পালন। ১৯৬৪-তে প্রাদেশিক সরকার পয়লা বৈশাখে ছুটি ঘোষণা করে এবং ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশেষত বাংলা একাডেমীতে 'ঐকতান' গোষ্ঠীর আয়োজনে বিপুল জনসমাবেশ হয়। ১৯৬৬-তে ছাত্র-ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রথম প্রভাতফেরি— 'এভাবে বাঙালির নববর্ষ পালনের ইতিহাস এই প্রথম।'

চল্লিশের দশকের কলকাতার গণনাট্য ও গণসংগীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশভাগের পরে যে-দুজন শিল্পী পূর্ব-পাকিস্তানে এসে সেখানকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পুষ্ট করলেন, তাঁরা হলেন কলিম শরাফী এবং শেখ লুতফর রহমান। কলিম শরাফী মূলত রবীন্দ্রসংগীতের অসামান্য গায়ক হলেও, অন্যান্য সংগীত, বিশেষত গণসংগীত প্রচারেও একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন— প্রথমে চট্টগ্রামে, পরে ঢাকায়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সুরারোপিত 'নবজীবনের গান' তাঁর মুখে তখন অনেকেই শুনেছেন। আর শেখ লুতফর রহমান তো একসঙ্গে গণসংগীতের রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক হিশেবে প্রায় কিংবদন্তি—গোটা পাকিস্তান আমল জুড়ে তাঁর প্রতিভার বিস্তার। পঞ্চাশের দশকের 'শিল্পী সংসদ' (যেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন আরেক অতুলনীয় গায়ক ও সুরকার আলতাফ মাহমুদ) থেকেই যাত্রা শুরু। পাশাপাশি ছিল নিজামুল হকের নেতৃত্বে 'ধুমকেতু শিল্পী গোষ্ঠী', 'পাকিস্তান শিল্পী সংসদ', পি-পি-টি-এ (আই-পি-টি-এ-র অনুসরণে), শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে 'বালুচর', মাহবুর রহমানের নেতৃত্বে 'মস্তানা' ইত্যাদি। এই সময় পাকিস্তানের প্রবল নিষেধাজ্ঞার আবহওয়ায় স্বনামে যেমন, তেমনি নিত্যনতুন ছদ্মনামেও গড়ে উঠতে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। আরেকটি প্রধান সংগঠন ছিল চট্টগ্রামে 'প্রান্তিক শিল্পী গোষ্ঠী'—কলিম শরাফী তাদের সঙ্গেই যুক্ত হন। ১৯৫২ নাগাদ ঢাকায় খানিকটা সম্মিলিত উদ্যোগে, গণনাট্য সংঘের আদর্শে, তৈরি হল 'অগ্রণী শিল্পী সংঘ'। শেখ লুতফর রহমানের নেতৃত্বে তারাই প্রথম ১৯৫৩-র ২১ ফেব্রুয়ারির ভোরে হাসান হাফিজুর রহমানের লেখা 'মিলিত প্রাণের কলরব' গেয়ে প্রভাতফেরি বের করে। সে বছরই আবদুল লতিফের সুরে 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' আলোড়ন তোলে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৯৫৪-র 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'-এ প্রতি সন্ধ্যায়

সামনে এসে দাঁড়ায় চট্টগ্রামের 'প্রান্তিক শিল্পী গোষ্ঠী' আর ঢাকার 'অগ্রণী শিল্পী গোষ্ঠী।' পরের বছরগুলিতেও নতুন-নতুন গোষ্ঠী এবং প্রতিবাদী গানের দল গড়ে উঠল এবং আন্দোলন-মিছিলের মধ্যে গণসংগীত আকাশবাতাসকে ভরিয়ে তুলল। সে-সময়ই আবদুর গাফফার চৌধুরীর একুশের কবিতায় প্রথম সুর দেন শেখ লুতফর রহমান, পরে আলতাফ মাহমুদ। শেষোক্ত জনের 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' ক্রমশই আন্দোলনেরই সুর। বহু স্মরণীয় গানে সুর দিয়েছেন লুতফর রহমান— যেমন ১৯৬৪-তে সিকান্দার আবু জাফরের লেখা 'জনতার সংগ্রাম চলবেই।' ষাটের দশকেই খুলনা-র 'সন্দীপন'—নাজিম মাহমুদের গড়া, সাধন সরকারের সুরে 'কৃষ্ণচূড়া আর রক্তিম পলাশের রঙিন জাল বুনে' এই একুশের গানটি ছড়িয়ে দিয়েছে সারা বাংলায়। ১৯৬৭ সালে তৈরি হল কামাল লোহানীর নেতৃত্বে 'ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী'। তাদেরই উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকার পলটন ময়দানের বিরাট সমাবেশে আলতাফ মাহমুদের গলায় শোনা গেল— 'ও বাঙ্গালি, ঢাকার শহর রক্তে রাঙ্গাইলি।' গণসংগীতের জনপ্রিয়তা তখন এত বেশি যে 'ছায়ানট' ও 'নজরুল একাডেমী'-র মতো সংগঠন, যেগুলি ছিল মূলত যথাক্রমে রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলসংগীত চর্চার কেন্দ্র, সেখানেও গণসংগীত শেখানোর ব্যবস্থা করতে হল।

বস্তুত 'ছায়ানট' এবং তারও বেশ আগের 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' ক্রমশই হয়ে উঠেছিল সে-সময়ের সবচেয়ে ব্যাপ্ত ও উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন। পূর্ববঙ্গের নৃত্যশিল্পী বুলবুলি চৌধুরীর নামাঙ্কিত একাডেমী মূলত ললিতকলার বিভিন্ন মাধ্যমের (কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্যকলা, নাটক, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য) শিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ষাটের দশকে রবীন্দ্রচর্চায় একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। বুলবুল ললিতকলা একাডেমী পরিবেশিত নৃত্যনাট্যের তালিকাটি দেখলেই তা বেশ টের পাওয়া যায়। তবে এ-ব্যাপারে আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিল 'ছায়ানট'। 'ছায়ানট' সংগঠনের চিন্তাটি আসে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উৎসবের পরেই। 'ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তেন'র উদ্বোধন ১৯৬৩-তে। 'ছায়ানট'-এর ক্ষেত্র প্রধানত রবীন্দ্রসংগীত হলেও তার বাইরে অনেক কিছুতেই তার অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ছায়ানট'-এর পরিকল্পনায় ১৯৬৭ থেকে ঢাকার রমনার মাঠে পয়লা বৈশাখের উৎসব পালন। কয়েক বছর আগে থেকেই তো বিপুল সমারোহে পয়লা বৈশাখ পালিত হচ্ছে, এমনকী 'ছায়ানট'ও তা পালন করে এসেছে, যেহেতু সেদিনই তাদের সংগীত বিদ্যায়তনের জন্মদিন। কিন্তু ১৯৬৭-তে রমনার খোলা প্রাকৃতিক পরিবেশে আয়োজিত ওই বৃহৎ উৎসব যেন তাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেল। পয়লা বৈশাখ দিনে-দিনে হয়ে উঠল বাঙালির জাতীয় উৎসব। সন্‌জীদা খাতুন তাই 'ছায়ানট' প্রসঙ্গেই উচ্ছ্বসিতভাবে বলতে পারেন, 'পহেলা বৈশাখ আমাদের আত্ম-আবিষ্কার।' সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাদের বসন্তোৎসব, শারদোৎসব, বর্ষামঙ্গল। শুধু গান গাওয়া ও গান শেখানোই নয়, নানা সামাজিক কাজেও যুক্ত হয়েছে 'ছায়ানট'। ১৯৬২-তে সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত দেশ, ১৯৬৪-তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়— 'ছায়ানট' তখন সাধ্যমতো ত্রাণের কাজে যুক্ত থেকেছে। ১৯৬৫-তে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করে এসেছে। ১৯৬৭-তে যখন রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে, পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের

বিবৃতিতে, তখনও 'ছায়ানট'-এর কর্মী-গায়ক-শিক্ষকেরা প্রতিবাদে শামিল। প্রথম প্রতিবাদ-সভার আয়োজন করেছিল অবশ্য 'ক্রান্তি'। বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি তো ছিলই, সংগঠন হিসেবে প্রতিবাদ জানাল 'ছায়ানট', 'আমরা কজন', 'শিল্পী ও সাহিত্য সংঘ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতি পরিষদ' এবং 'স্পন্দন' সাহিত্যগোষ্ঠী। এ ছাড়াও ঢাকার আর যে-সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতির বিরোধিতা করেছিল, তাদের মধ্যে নাম করা যায় 'বাংলাভাষা সংগ্রাম পরিষদ', 'বাণীচক্র', 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী', 'পূরব' ও 'ঐকতান'। উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকায় বসবাসকারী উর্দু সাহিত্যিকেরাও সংঘবদ্ধভাবে শাহাবুদ্দীনের বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ঢাকার বাইরেও সাংগঠনিক প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে। বিশেষ করে এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য খুলনা-র 'সন্দীপন' ও 'সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ'-এর ভূমিকা। সমকালীন ও পরবর্তী রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময়ও 'ছায়ানট' আগুয়ান দেশবাসীর সঙ্গে— ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান থেকে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত। মূলত অবশ্য গান গেয়েই— রবীন্দ্রসংগীত থেকে গণসংগীত সবই। শিল্পের চর্চা ও বোধ এবং স্বদেশ সম্পর্কে এই সজাগ একাত্মতা— দুইকে মিলিয়ে চলাটাই 'ছায়ানট'-এর ইতিহাস। বাংলাদেশের আর কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে এতটা বোধহয় আর বলা যায় না।

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে সংস্কৃতিকর্মীরা অনেকেই বিভিন্নভাবে সেই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন— দেশের ভেতরে বা বাইরে। আবার ব্যক্তিগতভাবেও কেউ নিজের কাজ করে গেছেন—লেখকেরা লিখেছেন, শিল্পীরা তুলি ধরেছেন, গায়কেরা গান গেয়েছেন। এমনকী গেরিলা-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ক্যাম্পে ফিরে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন কোনো-কোনো মুক্তিযোদ্ধা (মাহবুব আলমের 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে' বইটির দু-খণ্ডে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে)। কিন্তু তখন সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক রূপটা খুব স্পষ্ট ছিল না— বোধহয় সম্ভবও ছিল না সেই অগ্নিগর্ভ ও আক্রান্ত পরিবেশে। শুধু জানি, মুক্তিযুদ্ধের ঠিক মুখোমুখি বেশ কিছু নাট্যদল মঞ্চনাটক এবং তার চেয়েও বেশি পথনাটক বা পোস্টার-নাটকে ব্যাপৃত থেকেছে (লক্ষণীয় এর আগে পাকিস্তানি আমলে 'কবর'-এর মঞ্চায়ন ছাড়া প্রতিবাদী নাট্য আন্দোলনের কোনো ধারা চোখে পড়েনি) এবং সেই সূত্রে 'উদীচী গোষ্ঠী', 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ', 'পারাপার গোষ্ঠী' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। মমতাজউদ্দীন আহমদের রচিত ও নির্দেশিত 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' ও 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম' অভিনীত হয়েছে চট্টগ্রামের খোলা ময়দানে, বিপুল জনসমাবেশে। সেরকমই জেনেছি 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ', 'চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ,' 'সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী' ও 'লেখক সংগ্রাম শিবির'-এর কথা।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় 'ছায়ানট'-এর ভূমিকার কথা তো আমরা আগেই জেনেছি—যার পরিণতিতে গণসংগীতও হয়েছিল তাদের সংগীত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭১-এ মার্চের দিনগুলিতে যে উদ্বেগময় মুহূর্ত কেটেছে, 'ছায়ানট'-এর অন্যতম কর্ণধার সনজীদা খাতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণেই শুনি, 'ছায়ানট'-এর শিল্পীরা তো বটেই, অন্যান্য শিল্পীরাও অকুতোভয় লড়াই চালিয়ে গেছেন টেলিভিশনে পরিবেশিত গানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা-ও আর চলল না। অনেকেই শরণার্থী হয়ে চলে এলেন

কলকাতায়। তার মধ্যে ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন ও 'ছায়ানট'-এর শিল্পী অনেকেই ছিলেন। কলকাতায় জানা গেল এই শরণার্থী শিল্পীদের তৎপরতার অন্য রূপ— বাংলাদেশের ওই চেনা সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই পটবদল। কলকাতায় 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র ডাকে মিলিত হলেন বাংলাদেশের শিল্পীরা। তৈরি হল 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা।' অন্য অনেক একক বা সমবেত সংগীতের সঙ্গে উপস্থাপিত হল 'রূপান্তরের গান'— গীতি-আলেখ্য প্রাথমিক কাঠামো থেকে যা ক্রমশই নতুন চেহারা পেতে থাকল। রবীন্দ্রসংগীতের যে গান স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গাওয়া হয়েছিল, পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলনের স্মরণে আবার গাওয়া হল, সেই গান এবং আরো অনেক গান এখন গাওয়া হতে থাকল। এ ছাড়াও অন্য রবীন্দ্রসংগীত, সেই সঙ্গে নজরুলের গান, বাংলার পঞ্চ ভাস্করের গান কিংবা গণসংগীতকে অস্ত্র করে শিল্পীরা নেমে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের প্রচারে। আকাশে-বাতাসে ভাসতে থাকল পশ্চিমবঙ্গের সুরকারদের গানের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলাদেশের শেষ লুতফর রহমান, আবদুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ বা সাধন সরকারের গান। সংগীতশিল্পীরাও হয়ে উঠলেন মুক্তিযোদ্ধা।

ছয়

স্বাধীনতা-অর্জনের পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত যাকে বলা হয়েছে 'একুশের মূল্যবোধ' বা 'একাত্তরের প্রেরণা', তা বাংলাদেশের মানুষকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল এবং তার পেছনেও ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের অবদান। 'উদীচী' বা 'ছায়ানট-এর মতো প্রতিষ্ঠান সে-সময়ে আরো সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে, বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ১৯৭১-এর পর থেকেই বিভিন্ন নাট্যদল— প্রধানত 'নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়', 'থিয়েটার', 'আরণ্যক', 'ঢাকা থিয়েটার'—স্বাধীনতার মূল্যবোধের ক্ষয়ের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটা ইতিহাস সৃষ্টি করল বলা যায়। পাশাপাশি ছাত্রদের কথাও আলাদা করে বলা যায়।

কিন্তু অচিরে বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি গভীর সংকটের মুখোমুখি হল। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সামাজিক অবক্ষয়ের প্রসার, অর্থনৈতিক বিপর্যয় বাড়তেই থাকল। শেখ মুজিবুর রহমান নিরন্তর সমস্যার মধ্যে পড়লেন। তারই মধ্যে ১৯৭৪-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, যেখানে শেখ মুজিব লেখক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি মূল্যবোধের যে 'সংকট দেশে পাকিয়ে উঠেছে, তা দূর করে আত্মস্থ হবার ডাক দেন। কিন্তু, মুজিবের আমলেই দেখা যায়, সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সবচেয়ে বড়ো যে অঙ্গীকার সাম্প্রদায়িকতার বর্জন তা ব্যর্থ হচ্ছে।

১৯৭৫-এ মুজিব হত্যার পর, জিয়া ও এরশাদের আমলে, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ও প্রসার আরো ঘনীভূত হতে থাকল শাসকগোষ্ঠীর আরচণে ও প্রশ্রয়ে। অন্য দিক থেকে, বলাই বাহুল্য, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধেরও এটাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। বাহ্যত অবশ্য দেখা যায়, জিয়ার আমলে সরকারি স্তরেও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের কিছু-কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। জিয়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছেন কিংবা 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে 'জাতায় শিল্প সংস্কৃতি পরিষদ' গঠনের ঘোষণা করছেন ১৯৭৭-এ। সে-বছরই, শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে যে 'জাতীয় নাট্যোৎসব' আয়োজিত হয়, তাতে অবশ্য

ঢাকার বিখ্যাত নাট্যদলগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অজস্র নাট্যদলও যোগ দিয়েছিল তা-ই শুধু নয়, নাটকের নির্বাচনে বা প্রযোজনায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ছিল। নাট্যদলের সংখ্যা যে কত বিপুল, তা সুকুমার বিশ্বাস প্রণীত 'বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যোৎসব/কতিপয় দলিল'-এর পাতা ওল্টালেই বোঝা যাবে। বহু নাট্যোদ্যোগই এই বিরূপ পরিবেশেও দায়বদ্ধ সৃজনশীলতার গৌরবজনক প্রকাশ ঘটিয়েছে। ১৯৮১ সালে তৈরি হল 'গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন'—মোট ৬৭টি দলের মধ্যে ঢাকার ১৭টি, চট্টগ্রামের ১১টি এবং সারা দেশ জুড়ে অজস্র দল এর অন্তর্ভুক্ত। মফিদুল হক সঠিক বলেছেন, 'পূর্বে সংস্কৃতিচর্চা একান্তভাবে ছিল সংগীতনির্ভর, এখন সেখানে জায়গা করে নিল নাট্য আন্দোলন।'

তা বলে সংগীত আন্দোলন থেমে গেল তা নয়। ১৯৮১-তেই পরিকল্পিত হল 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন' এবং তারপর বছর-বছর তার আয়োজন। ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে। প্রথমে ছিল নিছকই সংগীত-প্রতিযোগিতা, পরে ক্রমশই তা হয়ে উঠল একটি 'তাৎপর্যময় সাংস্কৃতিক ঘটনা'—'সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের দায়।'

১৯৮২-তে এরশাদের উত্থানের সময়ই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ প্রবলতর রূপ ধারণ করল। সামরিক শাসনের ছত্রতলেই 'ছায়ানট', 'থিয়েটার', 'উদীচী' ও অন্যান্য সংগঠন সম্মিলিতভাবে শহিদ মিনারে 'বিজয় দিবস' উদ্‌যাপন করল, তিন দিনের অনুষ্ঠানে। সে-বছরই গঠিত হল 'চারুশিল্পী সংসদ' ও তরুণ চলচ্চিত্রকর্মীদের 'শর্ট ফিল্ম ফোরাম।' প্রত্যেকটিরই প্রতিবাদী চরিত্র খুব স্পষ্ট। ১৯৮৩-র জানুয়ারিতে 'ব্যাপকভিত্তিক একুশে উদ্‌যাপনের লক্ষ্য' নিয়ে মিলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভাবনা শুরু হল এবং তার সপক্ষে বিবৃতি দিলেন বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হল 'একুশে উদ্‌যাপন কমিটি ১৯৮৩।' সেই উপলক্ষে ১১ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারের অনুষ্ঠানে অংশ নিল 'ছায়ানট', 'উদীচী', 'ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী' থেকে শুরু করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল', 'নাগরিক', 'থিয়েটার', 'ঢাকা থিয়েটার', 'আরণ্যক' প্রভৃতি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪-তে 'যূথবদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনার ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী রূপ' লাভ করল 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট'। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল ঢাকা ও বাংলাদেশের প্রধান প্রায় সবকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।

১৯৮৭-র ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র-র সামনে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছিল 'জাতীয় কবিতা উৎসব'। প্রতিরোধের এও একটি স্বর। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত পর-পর চার বছর ধরে বিপুল উৎসাহে 'জাতীয় কবিতা উৎসব' পালিত হল ঢাকায়। প্রত্যেকবারই উদ্বোধন করেন বেগম সুফিয়া কামাল। প্রত্যেকবারই একটি করে স্লোগান থাকে উৎসবের— যথাক্রমে 'শৃঙ্খলমুক্তির জন্য কবিতা', 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা', 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা' এবং 'কবিতা চাই সন্ত্রাস' যাঁরা উৎসবগুলিতে সভাপতি বা সম্পাদক হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শামসুর রহমান, কামরুল হাসান, আহমদ শরীফ, ফয়েজ আহমদ ও মোহাম্মদ রফিক। 'বাংলাদেশের লেখক শিবির', যার সঙ্গে বদরুদ্দীন উমর ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যুক্ত ছিলেন, 'লেখক শিল্পী সংস্কৃতিকর্মী সহ সকল সৃজনশীল মানুষের ঐক্য' গড়ে তোলা ছিল যাদের লক্ষ্য, ১৯৯০-এ তাদেরই জাতীয় সম্মেলনের

স্লোগান ছিল 'সৃজনশীলতায় মুক্তির অঙ্গীকার।'

১৯৮৭-র ডিসেম্বর এরশাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন টেলিভিশনের ১১ জন শিল্পী, প্রধানত নাট্যকর্মীর ওপরে নেমে আসে নিষেধাজ্ঞা। তার প্রতিবাদে গড়ে ওঠে বেতার টিভি বর্জনের এক অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। অনেক শিল্পীই তাতে অংশ নেন।

এর পর দেখা যায়, লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে একের পর এক বিবৃতি প্রকাশ করছেন—কখনো রমজান মাসের সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে, কখনো সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে, কখনো বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবিতে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো প্রগতিশীল অংশও যে এগিয়ে এসেছিলেন, সেটাই লক্ষণীয়। মৌলবাদী বা পাকিস্তানবাদীরাও অবশ্য চুপ কর বসে থাকেননি— তাঁরাও পালটা বিবৃতি দিয়ে গেছেন। ১৯৮৮-এর ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' করার কথা বললেন। সঙ্গে-সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হল— তাতে সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সংযোগ স্থাপন করে ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি-জাতিসত্তা নির্মাণের যে ভিত তৈরি হয়েছিল, তাকে ধ্বংস করার কথা ভাবা হল। সে বছরই জুন মাসে বুদ্ধিজীবী লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের নিয়ে গঠিত হল 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি' এবং আহুত হল সর্বস্তরের সংস্কৃতি কর্মীদের সম্মেলন। সেখানে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার সিদ্ধান্তে প্রবল আপত্তি জানানো হল। ঘোষিত হল 'মনন ও সাংস্কৃতিক জীবনে মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিঘ্নিত' হয় এমন সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সেই কমিটিতে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক, লেখক ও শিল্পী, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র ও নাট্যশিল্পী ও কুশলী, সংগীতশিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, আইনজীবী, স্থপতি-কৌশলী- চিকিৎসক, সমাজকর্মী, ক্রীড়াবিদ ও খেলোয়াড়, ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নেতারা, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিক। নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনেরই পরিণামে এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটল।

গ্রন্থপঞ্জি

১. পূর্ববাংলা রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা। সাঈদ-উর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৩।
২. পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। রেজোয়ান সিদ্দিকী। বাংলা একাডেমী। ১৯৯৬।
৩. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস। মোহম্মদ হানান। অখণ্ড সংস্করণ ঃ আগামী প্রকাশনী। ১৯৯৯।
৪. নব্বুই-এর অভ্যুত্থান। সিরাজুল ইসলমাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত। প্রাসঙ্গিব প্রবন্ধ ঃ মফিদুল হক-এর 'সংস্কৃতি-বিনাশী স্বৈরাচার'। মুক্তধারা। ১৯৯১।
৫. গণ-আন্দোলন ১৯৮২-৯০। সৈয়দ আবদুল মকসুদ সংকলিত ও সম্পাদিত। প্রাসঙ্গিক অধ্যায় ঃ 'কবি শিল্পী বুদ্ধিজীবী'। মুক্তধারা। ১৯৯১।
৬. জীবনের গান গাই। শেখ লুতফর রহমান। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৩।
৭. স্বাধীনতার অভিযাত্রা। সন্‌জীদা খাতুন। নবযুগ প্রকাশনী ২০০৪।
৮. ভাষা-আন্দোলন ঃ সাহিত্যিক পটভূমি। হুমায়ুন আজাদ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা। ১৯৯০।
৯. বাঙালির সংস্কৃতি চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধ। সন্‌জীদা খাতুন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা। ২০০৫।